দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 JUL 1996
পৃঃ ৭ কলাম ৫

স্বাস্থ্য ও শিক্ষাঃ লক্ষণীয় পরিবর্তন

।। রুকুনউদ্দৌলাহ্ ।।

গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর। একদিন বিখ্যাত ছিল। কালচক্রে সে গ্রাম হয়েছিল অখ্যাত। সময়ের ব্যবধানে আবার পরিবর্তন আসছে। পরিবর্তনের এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে গ্রামটি আবার বিখ্যাত না হোক মর্যাদার আসনে দাঁড়াতে পারবে।

আজকের লক্ষ্মীপুর যখন বিখ্যাত ছিল তখন রাজা মুকুট রায়ের রাজধানী ছিল এখানে। রাজ্য বিস্তৃত ছিল উত্তরে মহেশপুর থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা এসব। সে সময় এর নাম ছিল ব্রাহ্মণনগর। এখানে ষোলশ' ব্রাহ্মণের বাস ছিল বলে জনপদটির এ নামকরণ করা হয়।

রাজা মুকুট রায় তার রাজধানীকে ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলেছিলেন। আকাশ-ছোঁয়া রাজ অট্টালিকা, সৈন্যসামন্ত, পাইক- পেয়াদা, মন্ত্রী-সেনাপতি, কোটাল আর নৃত্যপটীয়সীদের সমন্বয়ে ব্রাহ্মণনগর এত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল যে, পরবর্তী-কালে ব্রাহ্মণনগরের আর এক নাম হয় নবউজ্জয়নী, যার অর্থ নতুন নগর। আজকের লাউজানি এই নবউজ্জয়নীরই রূপান্তর।

এই লক্ষ্মীপুর যশোরের ঝিকরগাছা থানার একটি গ্রাম। জেলা শহর থেকে স্থলবন্দর সীমান্ত শহর বেনাপোল যেতে ১১ কিলোমিটারের মাথায় পড়ে ইতিহাসখ্যাত সেই লাউজানি। সেখান থেকে ডান হাতে এক কিলোমিটার কাঁচা পথ ভেঙে গেলেই গ্রামটি। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে ঘর। মনে হয় সাজানো।

পরিবর্তনের হাওয়ায় গ্রামটি চোখে পড়ার মতো বিষয় হচ্ছে শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি। মধ্য দশকে (১৯৯৫) দেশব্যাপী লক্ষ্যমাত্রা ছিল ইপিআই কর্মসূচির আওতায় ৬টি রোগের প্রতিষেধক টিকাদানের হার ন্যূনতম ৮০ ভাগে উন্নীত করা, নবজাতকের ধনুষ্টংকার দূরীকরণ, হাম রোগের প্রকোপ শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়ে আনা এবং হামজনিত মৃত্যুর হার শতকরা ৯৫ ভাগ হ্রাস করা, পোলিও মাইলাইটিস রোগ দূরীকরণ, কার্যকরভাবে ভিটামিন 'এ' ঘাটতি দূর করা, সার্বজনীনভাবে আয়োডিনযুক্ত খাবার লবণ ব্যবহার নিশ্চিত করা, ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অধিক পরিমাণ তরল জাতীয় খাবারের (ওআরটি) ব্যবহার শতকরা ৮০ ভাগ নিশ্চিত করা, অপুষ্টির হার এক-পঞ্চমাংশ (শতকরা ২০ ভাগ) বা এরও অধিকহারে কমানো, গর্ভজনিত কারণে মায়ের মৃত্যুর হার ৪ দশমিক ৫-এ কমিয়ে আনা, শিশুদের কৃমি বিস্তার রোধ করা প্রভৃতি। জাতীয়ভাবে গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন হয়েছে গ্রামটিতে।

গ্রামের প্রতিটি লোক শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন। গ্রামবাসীদের এ সচেতনতার দরুন গ্রামের ১৫-৪৫ বছরের কোন মহিলা এবং এক বছর বয়সের কোন শিশু টিকাদান থেকে বাদ পড়েনি। গ্রামের একটি শিশুও ধনুষ্টংকার, হাম, পোলিও, হুপিং কাশি, যক্ষ্মা ও ডিফথেরিয়া এই ৬টি রোগে আক্রান্ত হবার বা মারা যাবার রেকর্ড নেই।

লক্ষ্মীপুর এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী বেলায়েত হোসেন জানান, বর্তমানে গ্রামে এক বছর বয়সের মধ্যে ১৯৪টি শিশু আছে। এসব শিশুর প্রত্যেককে বিভিন্ন ডোজের টিকা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। একটি শিশুও এ থেকে বাদ পড়েনি।

গ্রামের প্রতিটি লোক নলকূপের পানি পান করে। জরিপে দেখা গেছে, গ্রামে ১৫৬টি নলকূপ আছে। যাদের নেই তারা প্রতিবেশীদের নলকূপ থেকে পানি নেয়। তবে রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর নিরক্ষর বয়স্ক মহিলা পুকুর ও খালের পানি ব্যবহার করে। তার সংখ্যা সীমিত। তারা বাস্তবতা মানতে চায় না। বলে, 'কলের পানি দে (দিয়ে) ভাত-তরকারি রানলি (রান্না করলে) ভালো হয় না।' বাড়িতে নলকূপ থাকলেও তারা রান্নার কাজে পুকুর ও খালের পানি ব্যবহার করে। তাদের বিশ্বাস, আগুনের তাপে সব রোগ জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়।

খোলা স্থানে পায়খানা করলে রোগ-ব্যাধি ছড়ায় তা গ্রামবাসী বুঝতে শিখেছে। এ বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে আদ-দ্বীন। এ সংস্থাটি প্রত্যেককে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া সহজ কিস্তিতে ঋণ দিয়ে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করছে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা। গ্রামের ৩শ' ২৬টি পরিবারের মধ্যে ২শ' ৪৪টি পরিবারের লোক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। বাকি যে ৮২টি পরিবার এখনো পায়খানা ব্যবহার করে না তাদের মধ্যে ২৭টি পরিবারের ভিটেমাটি নেই।

গ্রামের হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি পরিবার ছাড়া প্রত্যেকে খোলা লবণ ব্যবহার করে। এদের মধ্যে গ্রামের সুশিক্ষিত এবং সুধী বলে পরিচিতজনেরাও আছেন।

শিক্ষা : শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপুর আলোচিত পথের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

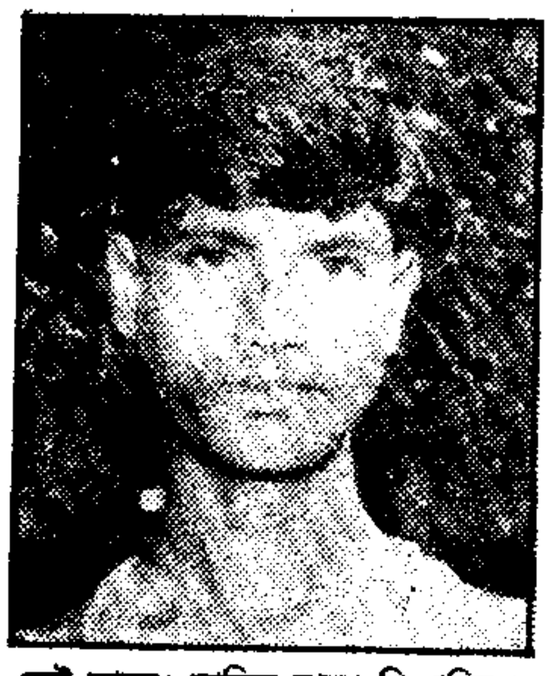

সেই আলম। দারিদ্র্য যাকে শিক্ষাবিমুখ করতে পারেনি। —সংবাদ

এই গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ১ হাজার ৫শ' ৯৬। এর মধ্যে ৩শ' ২৩ জন নিরক্ষর। এ হিসেবে গ্রামে শিক্ষিতের হার ৭৯ দশমিক ৭৭। গ্রামে ৭ থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত লোকসংখ্যা ৭শ' ২৩। এর মধ্যে ৭৭ জন নিরক্ষর। এ বয়সী লোকের শিক্ষার হার শতকরা ৮৯ দশমিক ৩৫। গ্রামে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর (৬ বছর বয়স পর্যন্ত) সংখ্যা ১শ' ৮। বিদ্যালয়ে যায় ৮৮ জন। বাকি ২০ জন বিদ্যালয়ে যায় না বলা যাবে না। ৭ থেকে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা ২শ' ৬৬। এদের মধ্যে মাত্র ১৯ জন স্কুলে যায় না। শতকরা হিসেবে এর পরিমাণ ৭ দশমিক ১৪। এসব শিশুর স্কুলে না দেবার কারণ সম্পর্কে অভিভাবকদের কোন সুনির্দিষ্ট জবাব নেই।

গ্রামের স্কুল বলতে লাউজানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিউ মডেল হাই স্কুলই ভরসা। লাউজানির একটি অংশের নাম লক্ষ্মীপুর। এ গ্রামটি ৫৫ নং লাউজানি মৌজার অন্তর্ভুক্ত। শিশু-কিশোরদের প্রায় সবাই সেখানে পড়ে। বাকিরা যায় ঝিকরগাছায়। আর কিছু পড়ে ব্র্যাক পরিচালিত ৩টি উপানুষ্ঠানিক স্কুলে।

বছর দুয়েক আগে সোয়া ৩শ' পরিবারের এই ছোট গ্রামটিতে ১০টি স্কুল ছিল। এনজিওরা এগুলো চালাতো। এর ৬টি চালাতো রুরাল রি-কনস্ট্রাকশন সেন্টার (আরআরসি) এবং বাকি ৪টি ব্র্যাক। এর মধ্যে আবার শিশুদের ৫টি, মহিলাদের ৩টি ও পুরুষদের ২টি ছিল। টার্গেটিকৃত মহিলা-পুরুষের সবাই সাক্ষরসম্পন্ন হওয়ায় বয়স্ক স্কুল ৫টি তুলে নেয়া হয়েছে। স্কুল গমনোপযোগী শিশুর অভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ৫টি শিশু স্কুলের ২টি, এখন ৩টি চলে। পরিচালনা করে ব্র্যাক। সেখানে পড়ে ৯০ জন শিশু। আর সবাই লাউজানি প্রাইমারি স্কুলে যায়। ভিটেমাটিহীন এক মহিলার নাম সায়রা বেগম। ভাইয়ের ঘরের চালে চাল ঠেকিয়ে একচালা একটি খুপরি বানানো। দু'ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে সেখানে। পরের গরু-ছাগল পোষানি (ভাগে) নিয়ে এবং চুক্তিতে অন্যের ছাগল মাঠে চরিয়ে ও গৃহস্তবাড়িতে কাজ করে যা পায় তাই দিয়ে সংসার চালায়। এত কষ্ট তবু তার সন্তান দু'টিকে পড়াচ্ছে। মেয়ে রেশমা বড়, সে পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে। ছেলে মনিরুল পঞ্চম শ্রেণীতে। লেখাপড়া রেখে কাউকে কাজ করতে দেয় না। দিনমজুর মুনসুর আলীও পিছিয়ে নেই। তার একমাত্র মেয়ে পারুলকে স্কুলে দিচ্ছে। পড়ে ৫ম শ্রেণীতে। ভালো রেজাল্টের জন্যে পেটের ওপর থেকে খোরাকি বাঁচিয়ে মাঝে মধ্যে মেয়েকে প্রাইভেটও পড়ায়।

স্কুলে যায় সেই আলমও। ১৯৮৮ সালে তার বয়স ছিল বছর আটেক। ঐ বছর মার্চ মাসে মাঠে ছাগল চরানোর সময় তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, স্কুলে যাওনা কেন? সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিল, 'ইসকুলি গেলি ছাগল খাওয়াবে কিডা?' আলমের ছবিসহ তার অভিব্যক্তি ছাপা হয়েছিল '৮৮ সালের ১৪ই জুন 'সংবাদ'-এ। তার বাবা লুৎফর রহমান গরিব ক্ষেতমজুর। একদিন কাজ না করলে উপোস থাকতে হয়। কিন্তু সেদিনের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। দারিদ্র্য আর আলমকে মাঠেঘাটে আটকে রাখতে পারেনি। সে স্কুলে পড়ছে। লাউজানি হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সে।

ভিটেমাটি সহায়-সম্পদহীন মহিলা সায়রা বেগম (ডানে) ও তার মেয়ে রেশমা। সায়রার দিন চলে না। তিনবেলা কখনই পেট ভরে খাওয়া জোটে না। এরপরও সে তার মেয়েকে স্কুলে পাঠায়। বই, খাতা, কলম, স্কুল ড্রেসের ঘাটতি নেই রেশমার।